



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 115 - 122

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দয়ারামের 'বিনন্দ রাখালের পালা' : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান

অর্ঘ্য ব্যানার্জী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Email ID: banerjeearghya2014@gmail.com

 0009-0007-7806-3035

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Short-studied
Mangalkavya,
Kamala, Lakshmi,
Paddy, Philosophy
of life, Agriculture,
18th Century,
Culture & Society,
Famine and
Relevance.

Abstract

The genre of Mangalkavya in Bengali literature constitutes an integral part of Bengal's cultural history and represents a significant branch of the historical consciousness of the Bengali people. Discussions of ancient and medieval Bengali literature are, in essence, examinations of social and cultural life. Central to these discussions are rituals of worship, codes of conduct, belief systems, and institutional practices. Within the Mangalkavyas lies considerable scope for historical inquiry. The spiritual beliefs of the Bengalis, their everyday practices, hopes and aspirations, as well as their joys and sorrows, find expression in these texts. Owing to their grounding in social reality, the Mangalkavyas serve as one of the principal sources for reconstructing the social history of Bengal.

Through an analysis of Dayaram's Laxmicharitra or Binandarakhaler Pala, it is possible to discuss both the glory of the goddess Laxmi and her influence on folk life, particularly in relation to the means by which human suffering is overcome. Since Dayaram was active until the closing decades of the eighteenth century, his work reflects not only the early phase of colonial rule but also depicts the catastrophic Bengal famine of 1769, commonly known as the Great Famine of 1176 (Bengali era). His Laxmicharitra was composed against the backdrop of this famine. Alongside the glorification of Goddess Laxmi, the poem narrates episodes such as Binanda's cultivation of paddy, the seizure of his crops by King Birat, the goddess's residence in Binanda's household, the construction of a city by Visvakarma for Binanda, Laxmi's punishment of King Birat, the king's eventual restoration to the throne, and Binanda's marriage to the king's daughter. Simultaneously, the poem vividly portrays the cries of famine-stricken people.

Although these folk narratives do not contain an elaborate storyline like conventional Mangalkavyas, the rural social psyche is clearly reflected in these deity-centered narratives situated within a folk and mythological framework. Through the story of the landless Binanda receiving divine grace, the text reveals the pain and suffering of eighteenth-century people, as well as

their faith in divine deliverance from crisis. In this poem, too, the impoverished shepherd Binanda is shown to be freed from deprivation through the benevolence of Goddess Laxmi.

From the narrative structure of the poem, we observe the transformation of fallow land into cultivated fields. Binanda is abducted by King Birat for failing to pay land revenue. As Binanda is the blessed son of Goddess Laxmi, the king's persecution of him leads to the king's downfall and loss of divine favor. Eventually, by marrying his daughter to Binanda, the king atones for his sins. Embedded within this narrative are depictions of rural life, various folk customs, religious festivals, and ritual practices. This poem is fundamentally a literary representation of folk life. The special significance of these palas in Bengali literature becomes evident through such analysis, which also brings into focus the cultural milieu of the Medinipur region.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারাটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালির ইতিহাসের একটি শাখা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনা। এই আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে পূজা-অর্চনা, নিয়ম-নীতি, ধ্যান-ধারণা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। মঙ্গলকাব্যে বাংলার গণমানসের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। এই কাব্যগুলির মধ্যেই ইতিহাস অন্বেষণের অবকাশ থাকে। বাঙালির আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, তার দৈনন্দিন জীবনচরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনা মঙ্গলকাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক বাস্তবতার গুণে মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন।

সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। তাই সাহিত্যের মধ্যে রচয়িতা চেতন বা অবচেতন ভাবে সমাজের নানান দিকের প্রতিবিম্বকে প্রতিফলিত করেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারাতেও এই দিকের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। খ্রি. ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী পর্যায় (তুর্কি আক্রমণ) থেকে খ্রি. অষ্টাদশ শতক (ভারতচন্দ্রের কাল) পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। এই সময় বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- গীতিসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি। এই ধারাটি ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় পাঁচশো বছর ধরে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলকাব্য ধারাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল বাংলার জনসাধারণের নিজস্ব জীবনদর্শন। সমাজের যাবতীয় খুঁটিনাটি দিকের ছাপ মঙ্গলকাব্যে পড়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগুলিকে প্রধান বা বহুল প্রচলিত মঙ্গলকাব্য আর 'কমলামঙ্গল' বা 'লক্ষ্মীমঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'সারদামঙ্গল', 'গঙ্গামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগুলিকে অপ্রধান বা স্বল্পচর্চিত মঙ্গলকাব্যের গোত্রভুক্ত করা যেতে পারে। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত অনালোচিত মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কাব্যগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্যে স্বল্পচর্চিত মঙ্গলকাব্য ধারায় 'বিনন্দরাখালের পালা' বা 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যটির বিশেষ তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের আলোচনার বিষয় কবি দয়ারামের 'লক্ষ্মীচরিত্র' বা 'বিনন্দরাখালের পালা' কাব্যের সমাজ ইতিহাস অনুসন্ধান। এই আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা মধ্যযুগের কবি দয়ারাম সম্পর্কে একটু আলোকপাত করে নেবো। মধ্যযুগের কবি দয়ারাম দাস সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানা এলাকার ভোগপুর গ্রাম পঞ্চগয়েত-এর অন্তর্গত কিশোরচকের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন কাশীজোড়ার সভাকবি। বাংলা কাব্যচর্চা ও সমাজচর্চার ইতিহাসে কবি দয়ারাম দাস বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে দয়ারামের কাব্যগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কবি দয়ারাম সময় ও সমাজ সচেতন কবি ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসটা একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান জেলা। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব মেদিনীপুরে বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধ যুগে মেদিনীপুরের চরম উন্নতি লক্ষ করা যায়। বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল তথা পাল রাজবংশ গৌড়ের সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন। তখনকার বহু ঘটনার সঙ্গে মেদিনীপুরের যোগ লক্ষ করা যায়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মিরকাশিমের সঙ্গে সন্ধি অনুসারে বাংলার যে তিনটি জেলা সর্বপ্রথম ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয় তার মধ্যে মেদিনীপুর অন্যতম। মেদিনীপুর; বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত হওয়ার ফলে ঐতিহাসিক ও জনশ্রুতি মূলক নানা প্রাচীন গড়, দেবালয় প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তিতে পরিপূর্ণ। সর্বোপরি বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুরের নাম চিরস্মরণীয়।

মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস লক্ষ করলে জানা যায় যে সেখানকার রাজন্যবর্গ কাব্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করতেন। তার প্রমাণ দয়ারাম দাস ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। কারণ তাঁরা ছিলেন কাশীজোড়ার সভাকবি। এখন আমরা দয়ারামের কাব্যগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর কাব্য রচনাকাল ও কাব্যমধ্যে কবি নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন তা বোঝার চেষ্টা করবো। দয়ারাম স্থানীয় জমিদারের অনুগ্রহ লাভ করে মেদিনীপুরের কিশোরচকে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং কাব্য রচনা করেছিলেন। দয়ারাম নিজের সম্পর্কে কাব্য মধ্যে বলেছেন তাঁর পিতা জগন্নাথ, পিতামহ ইন্দ্রজিৎ মতান্তরে পরীক্ষিত। আর প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিৎ।

এখন আমরা ‘লক্ষ্মীচরিত্র’ কাব্যটির ভগিতাগুলি উল্লেখ করে দয়ারামের কাব্য রচনার সময়কাল অনুধাবন করবো। এই কাব্যের একটি পুথির লিপিকাল ১২২৬। উক্ত পুথির ভগিতাটি হল -

“কাশীজোড়া মহাস্থান নরনারায়ণ
ধন্য হে ধার্মিক নরপতি
হইয়া তাহার প্তষ্ঠী
কিসরচৌকে তাহার বসতি।”^১

পুথির পুষ্পিকায় রয়েছে -

“স্বাক্ষর শ্রী পদ্মলোচন আচার্য সাং পশড়া। এ পুস্তক হরিপ্রসাদ রাউত সাং পোনান। ইতি সাল ১২২৬
সাল ১ চৈত্র।”^২

অপর আর একটি পুথির লিপিকাল হল - ১২৭৩। সেই পুথির ভগিতাটি হল -

“কাশীজোড়া মহাস্থান মহারাজ শূন্দর নারায়ণ(সুন্দরনারায়ণ)
ধন্য হে ধার্মিক নরপতি
হইয়া তাহার প্ত দআরাম রচে গীত
কিশোরচকে জাহার বসতি।”^৩

পুথির পুষ্পিকায় রয়েছে -

“ইতি বিনন্দ রাখালের পালা শমাণ্ড। যথতি দৃষ্ট তথাতি লিখিতং শ্রী বনমালী দেবশূর্মা। সাং পশড়া পঃ
মন্ডলঘাট। পঠনার্থে শ্রীভজহরি মাইতি সাং পোনান পঃ মন্ডলঘাট। সাল ১২৭৩ সাল সাং ২৯ কার্তিক
বুধবার বেলা দুই দন্ড থাকিতে সমস্ত হইল। এই পুতি জে লইবেক শে তাহার বংশ লক্ষিছাড়া হইবেক।”^৪

সাহিত্য পরিষদের একটি ‘লক্ষ্মীচরিত্র’ পুথির ভগিতা হল -

“কাশীজোড়া মকাম রাজা তায় সুন্দরনারায়ণ
সভা হৈতো ধর্ম নরপতি।
হৈত্যা তার প্রতিষ্ঠিত দয়ারাম রচে গীত
কিশোরচকে যাহার বসতি।”^৫

পুথির লিপিকাল ১০৮৮ সাল। এটিকে মল্লাদ ধরলে হয় ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে।

উপরিউক্ত ভণিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে; কবি দয়ারাম দাসের কাব্যে কাশীজোড়ার নরনারায়ণ (১৭৪৪-১৭৫৬) ও সুন্দরনারায়ণ (১৭৭০-১৮০৬) এর রাজত্বকালের উল্লেখ পাচ্ছি। এর থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁর কাব্য সাধনা দীর্ঘ কাল পরিধির মধ্যে। তবে সুকুমার সেন ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সরস্বতী কথা প্রসঙ্গে বলেছেন ‘স্থানীয় ভূস্বামী তাঁহার পোষ্টা ছিলেন।’ অর্থাৎ দয়ারামের আশ্রয় দাতা হিসাবে কোন রাজার নামের উল্লেখ করেননি। যোগেশচন্দ্র বসু ‘বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর’ গ্রন্থে দয়ারামের আশ্রয়দাতা হিসাবে নরনারায়ণের নাম উল্লেখ করেছেন। আমরা এই সমস্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলতে পারি যে কবি দয়ারাম দাস অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কাব্য সাধনা শুরু করেছিলেন।

দয়ারামের ‘লক্ষ্মীচরিত্র’ বা ‘বিনন্দ রাখালের পালা’ কাব্যটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেবী লক্ষ্মীর মহিমার কথা ও লোকজীবনে তার প্রভাবের কথা উল্লেখ করে মানুষের দুঃখ জয়ের রসদের দিকটিকে আলোচনা করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে দয়ারাম যেহেতু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন তাই তাঁর কাব্যে আমরা যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভটুকু পাই তেমনি ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের বাংলাদেশের ভয়াবহ মন্বন্তর তথা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাঙালি জীবন কৃষি নির্ভর ছিল। বিদেশী পর্যটকরা ও মুসলমান প্রত্যক্ষদর্শীরা এই সময়ের প্রথমার্ধের আর্থিক সমৃদ্ধির গুণগান করেছেন। বাংলার অন্যতম ফসল ধান। ধানের প্রাচুর্যের কথা সে সময়ের ঐতিহাসিকদের বিবরণী থেকে জানা যায়। তবে সে যুগের সাহিত্যে মূলত ব্যাধ ও বণিক সমাজ বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। সেদিক থেকে দয়ারামের ‘লক্ষ্মীচরিত্র’ বা রামেশ্বরের ‘শিবায়ন’ ব্যতিক্রমী। এই কাব্যগুলিতে কৃষি নির্ভর গ্রাম বাংলার এবং কৃষক সমাজের চিত্র পরিস্ফুট। কবিরা বারবার দুঃখ দারিদ্রের কথা শুনিয়েছেন। মন্বন্তর (১১৭৬) পীড়িত বাংলার কাতর প্রার্থনা যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে দয়ারামের ‘লক্ষ্মীচরিত্র’ কাব্যটিতে। পার্থিব ও অপার্থিব মঙ্গল কামনার জন্য কবি দেবী লক্ষ্মীর স্মরণাপন্ন হয়েছেন। কৃষিজীবী বাঙালি গৃহস্থের দিনলিপির কথা কবি দয়ারাম তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। এই কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিনিধি স্থানীয় কাব্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও দেবী লক্ষ্মী বারবার বন্দিত হয়েছেন ধন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাদের কাব্যের বন্দনা অংশেও দেবী লক্ষ্মীর বন্দনা করেছেন। লক্ষ্মী দেবী যখন রুগ্ন হন, তখন ফসল হয় না, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, গৃহস্থরা সর্বস্বান্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় পুরাতন ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও ভাবী যুগোপযোগী ঐতিহ্য সৃজন। বিগত ও আগত দুটি কালের সন্ধিক্ষণ এই শতাব্দী। ফলে উভয় সময়ের লক্ষণ এই শতাব্দীর সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যে লক্ষ্মীদেবীর মহিমা বর্ণনার পাশাপাশি বিনন্দের ধান রোপন, বিরাট রাজা কর্তৃক ধান অপহরণ, বিনন্দের ঘরে লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান, বিনন্দের জন্য বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নির্মাণ, লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক বিরাট রাজাকে শাস্তিদান এবং রাজার সিংহাসন লাভ ও তার কন্যার সঙ্গে বিনন্দের বিবাহ কথার বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কাব্যে মন্বন্তর পীড়িত মানুষের হাহাকারের চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। কবির সমাজ সচেতনতার দিকের বহিঃপ্রকাশ কাব্যে যেভাবে ঘটেছে তাতে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমূহ প্রত্যক্ষ করার ছাপ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কাব্যের কাহিনির মধ্যে, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে বাঙালি জীবনবোধের উপকরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে একদিকে নিরন্ন মানুষের আর্তনাদ; অন্যদিকে সমাজের তমসাস্ফল্য রূপ, নীতিহীনতা এবং অবক্ষয়ের চিত্র। আমাদের আলোচ্য কাব্যেও দেখি বারো দিনের পুত্রকে ঘরে রেখে বিনন্দের পিতা স্বর্ণ লাভ করলে; স্বভাবতই তখন তাদের অনাহারে দিন অতিবাহিত হয়। আবার কখনো বনকচু, খুদের জাউ খেয়েও দিন কাটাতে হয় -

“পুরান খুদের জাউ অর্দ্ধ গুলি কন।

বনকোচু কলা মুড়ি দুই সন্ধা ভোজন।”^৬

বিনন্দ খুদের কুঁড়া খেয়ে নিত্য দিন যাপন করেন। আর প্রতিদিন গোরু নিয়ে গোষ্ঠে চরাতে যায়। দুঃখেই তার জীবন কাটে। এমনকি অন্নের আকালে তার সাত ভাই মারা যায়। এই অবস্থায় বিনন্দের দুঃখ কথা শুনে দেবী লক্ষ্মী বলেন -

“এত বলি ঈশ্বর দিলেন দিলেন পরিচয়।

গ্রাম বাংলার মানুষের প্রধান জীবন ও জীবিকা কৃষিকাজ। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধানই প্রধান শস্য। স্বাভাবিক কারণে লোকায়ত সমাজ মানসে ধান নিছক একটি শস্য হয়ে থাকেনি। তা পরিণতি পেয়েছে ধনের সমার্থক হিসাবে। সেজন্য রাঢ় বাংলার সমস্ত এলাকায় শস্যলক্ষ্মী তথা ধান্যলক্ষ্মী; পারিবারিক লক্ষ্মীর রূপ লাভ করেছে। যে কারণে যার বাড়িতে যত বেশি ধানের গোলা তিনি ততবেশি ধনের অধিকারী অর্থাৎ লক্ষ্মীর কৃপা ধন্য।

কাব্যে আমরা দেখি ভাগাড়ে, শ্মশানে বিনন্দ ধান চাষ করেছে। কিন্তু রাজাকে কর না দিয়ে যত গো-চর ও জায়গা ছিল সেখানে চাষ করেছে বলে রাজার কাছে অভিযোগ করলে রাজা আদেশ দিলেন রাখালিয়াকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার জন্য। আর সেই সঙ্গে ‘বায়ান্ন বাটি পাকা ধান্য বিংসতি খামার’ সব কিছু লিখে নেয় রাজা। এরপর সন্ধ্যাকালে বাড়ি ফিরে যায় বিনন্দ। সে মাত্র ‘কচা দুই ধান’ পেল। পরে অবশ্য দেবীর কৃপায় বিনন্দের রত্নময়পুরি লাভ ও রাজার কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার ভাগ্য লিখন নির্ধারিত হয়। বোঝাই যায় বিষ্ণুর বণিতা দেবী লক্ষ্মীই বিনন্দে আশ্রয়স্থল, রক্ষাকর্তা। পরবর্তী লাচাড়িতে কবি, বিরাট রাজার দুঃখ কথা কে তুলে ধরেছেন। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হলে রাজার ঘর ও প্রাচীর ভেঙে পড়ে; এমনকি রাজরানী ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে দেখা যায় ভিক্ষা করে তার দিন চলতে লাগল, কমলার রুগ্ন হওয়ার কারণে বিরাট রাজার জীবনে দুর্দশা নেমে আসে—

“দ্বাদশ বৎসর রাজ্য দুঃখ ভোগ করে।

সদত কুরার জাউ দুসন্ধ্যা ভোজন।

অন্নদলা অদ্যাবধি না মিলে কখন।”^{৯৬}

দেবী কমলা যার প্রতি রুগ্ন হবেন তার জীবন তো অন্ন উপবাসেই কাটবে। প্রতিদিন ভিক্ষা করে দিন যাপন করতে থাকা বিরাট রাজা বিনন্দ রাখালের আতিথ্যের কথা শুনে পত্নী সহ সেখানে যাবার কথা ভাবেন। কারণ বিনন্দ রাজা সর্বদাই ভিক্ষু, দুঃখী জনকে ‘ধন কড়ি’ দেয়। বিরাট রাজা পরে জানতে পারেন যে বিনন্দ রাখাল দেবীর বর পুত্র। আর তার নিন্দা করার জন্যই রাজা লক্ষ্মীছাড়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেবী রাজাকে জানায় যে তার সব দোষ ক্ষমা করা হবে তবে দেবীর বর পুত্র বিনন্দের হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করতে হবে। দেবী কমলার কথায় বিরাট রাজা, তার কন্যাকে বিনন্দের হাতে সমর্পণ করেন। এরপর বিরাট রাজা দেবীর কৃপায় ভাগ্য ফিরে পায়।

রাজকন্যার সঙ্গে বিনন্দের বিবাহ উপলক্ষে নানান ঘটনা দেখা যায়। এমনকি বিনন্দকে আইবুড়ো স্নান করানোর জন্য পুকুর নির্মাণ করা হয়। নানা ভূষণে বিনন্দকে ভূষিত করে সাজানো হয়; গলায় মালা, মাথায় রত্ন মুকুট। শাস্ত্র অনুসারে মধুর বচনে মঙ্গল রবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে বিনন্দের ঘর। কাব্যে দেখা যায় দেবীর কৃপায় বিনন্দ দোলাতে বসে বরযাত্রী সহ বিয়াল্লিশ বাদ্য সহযোগে যাত্রা করেন। বরের মুখ দেখে মোহিত হয় সব অঙ্গনা। কবির ভাষায়—

“পূর্ণঘট আওগণ আগুলি পথে।

ধিবরের ধৈর্য্য ধরা মৎস্য দেখাইতে।।

কারে দিল গুয়া পান বিচিত্র বসন।

পদকো পঞ্জিকা সঙ্গে জাত্রির লক্ষণ।।

ভূপোত্তির ভূবনে গিয়া পহুছিল বর।

রূপে গুনে জৌবনে জিনাছে চরাচর।।”^{৯৭}

এই অংশে কবি নানা বিবাহের লোকাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। নারীগণের সঙ্গে নৃপতি জায়া এসে জামাতার চাঁদ মুখ দেখে সব দুঃখের অবসান হয়। ‘কপালে চন্দন চাঁদ সীন্দূরের ফোটা’ দিলে দেখে মনে হয় তরুণ অরুণের উদয় হলো। বিনন্দকে বিচিত্র বসন ও কর্ণ কুণ্ডল সহ স্বর্ণ দেওয়া হল। ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে শঙ্খ ধ্বনি সহ বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সুবর্ণ সিন্দুর পড়িয়ে বিনন্দ বিবাহ সম্পন্ন করেন। শাস্ত্র মতে সমস্ত আচার-আচরণ পালন করা হয়। দ্বিজগণের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে শুভক্ষণে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি-সহ বিরাট রাজার কন্যাকে বিনন্দের হাতে সমর্পণ করেন। রাজা বিনন্দকে রথ, হাতি, ঘোড়া সহ সুবর্ণ হার দিয়ে বরণ করেন—

“শঙ্খ ধ্বনি হুলাহুলি করে আত্মাগন।

বর কন্যা বাসরে বাঞ্চিলা দুইজন।।
 ঝালে ঝালে করিলা জে সকলে।
 পানগুয়া কোপ্পুর প্রবন্ধ জায় ফলে।।
 শরণ করিলা সভে সুবর্ণের ঘাটে।
 রত্নপ্রদীপ জ্বলে তাহার নিকটে।।
 রজনী প্রভাত হৈল রবির উদয়।
 বিনন্দরাখালে লক্ষী বিবরণ কর।।”^{১১}

বিরাট রাজা জামাতাকে বিদায় জানায়, বিবিধ যৌতুক তাকে প্রদান করে। সেই সঙ্গে অর্ধেক রাজ্য, ধনরত্ন সমস্ত কিছুই বিনন্দকে রাজা দেন। সংস্কার অনুযায়ী দুর্বা দিয়ে জামাতা ও কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। জননী, কন্যাকে জানায় প্রতি মাসে খবর নেবেন; আর যত্ন ভরে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে। এর ফলস্বরূপ ধনধান্য বাড়বে। এরপর বাদ্য বাজিয়ে ঐরাবতে চড়ে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে দেবী কমলাও শঙ্খধ্বনি করেন। যথাসময়ে রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বিনন্দ নিজের গৃহে প্রবেশ করেন। পুত্রবধূকে কাছে পেয়ে খুশিতে বিনন্দের মাতা কমলার চরণ স্মরণ করেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে সংস্কার অনুযায়ী দ্বিজ ব্রাহ্মণ ধান, দুর্বা দিয়ে বেদ মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করেন। কমলার বরে রাজটীকা রত্ন সিংহাসন লাভ করেন। বিনন্দ কমলার বর পুত্র। বিনন্দ দানের ক্ষেত্রে কর্ণের সমান। পুত্রের মতো সকল প্রজাকে তিনি পালন করেন।

কাব্যের অন্তিমের দেখা যায়, বিনন্দ এরপর থেকে কমলার বরে সুখ-শান্তিতে রাজত্ব করতে থাকে। বিনন্দের মাতা ও বিনন্দ প্রতি বৃহস্পতিবারে তথা গুরুবারে দেবী লক্ষ্মীর পূজা করেন। সংস্কারবশত ঐদিন রীতি মেনে খই ভাজা ও মৎস্য পোড়া ভক্ষণ করেন না। দেবীর আজ্ঞা মতো বিনন্দ মর্ত্যে লক্ষ্মী পূজা প্রচার করেন। এখানেই কবি দয়ারামের লক্ষ্মীর মঙ্গল গান সমাপ্ত হয়।

প্রথাগত মঙ্গলকাব্যের মতো এই লোককাব্যগুলিতে বিস্তৃত কাহিনি না থাকলেও লোকায়ত ও পৌরাণিক পরিমণ্ডলে এই সমস্ত দেব-দেবী নির্ভর কাব্য-কথায় গ্রামীণ সমাজমানস স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এই পালাগুলির কাহিনিতে কোথাও জটিলতা নেই। সরলতাই পরিলক্ষিত হয়। ভূমিহীন বিনন্দর দেবী কর্তৃক কৃপা লাভের কাহিনির মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার ছবি যেমন প্রকাশিত হয়েছে; তেমনি দেবতা কর্তৃক সংকট থেকে মুক্তি পাবার চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যেও দেখা গেছে হত দরিদ্র রাখালিয়া বিনন্দ দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় অভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। কাব্য কাহিনি সূত্রে আমরা দেখি অনাবাদী জমিকে আবাদী করা হয়েছে। আর রাজকর না দেওয়ার জন্য বিরাট রাজা কর্তৃক বিনন্দ অপহৃত হয়েছে। দেবী লক্ষ্মীর বরপুত্র বিনন্দ। তাই তার দুঃখ ভোগের জন্য বিরাট রাজার পতন ও লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। পরে আবার রাজা নিজের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজের পাপস্খালন করেন। এই কাহিনির বয়নে গ্রামীণ মানুষের জীবন কথা, নানান লোকাচার, ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানের কথাও লুকিয়ে আছে। এই কাব্য লোকায়ত জীবনের কাব্য।

‘লক্ষ্মীমঙ্গল’ কাব্যের মূল ভিত্তিই হলো কৃষি। দেবী লক্ষ্মী এখানে কেবল ভাগ্যের দেবী নন, তিনি শস্যের (বিশেষত ধান) প্রতীক। যা তৎকালীন বাংলার উর্বরতা ও কৃষি পদ্ধতির পরিচয় দেয়। কৃষকের সাথে ভূমির সম্পর্ক এবং খরা বা অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা তৎকালীন কৃষি-সংকটের ঐতিহাসিক প্রমাণ। মধ্যযুগের বাংলার অর্থনীতির একটি বড় অংশ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। চণ্ডীমঙ্গলের মতো লক্ষ্মীমঙ্গলেও বণিক চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- বণিক শ্রেণি, কারিগর ও শিল্পীদের জীবনযাত্রার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব কতটা ছিল। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বা বিনয় ঘোষের মতো পণ্ডিতরা মঙ্গলকাব্যকে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্ব অপরিমিত। মঙ্গলকাব্যগুলো সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের লৌকিক দেবতা এবং সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। লক্ষ্মীমঙ্গলও এর ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যে বাংলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এই কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন শাক-

সবজি এবং রান্নার পদ্ধতি তৎকালীন আঞ্চলিক খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় দেয়। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে 'লক্ষ্মীর ব্রত' কীভাবে আঞ্চলিক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পালিত হতো, তার বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। কাব্যের বর্ণনা থেকে তৎকালীন গ্রামবাংলার ঘরবাড়ির গঠন এবং নদীমাতৃক বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশের আঁচ পাওয়া যায়। বিভিন্ন আঞ্চলিক নদী, খাল এবং গঞ্জের নাম অনেক সময় এই কাব্যে রূপকের আড়ালে স্থান পায়, যা স্থানীয় ভূগোল পুনর্গঠনে সাহায্য করে। লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যে গ্রামীণ নারীর ঘরোয়া অর্থনীতি পরিচালনা, শস্য সংরক্ষণ এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে, তা বাংলার নারীর স্থানীয় সামাজিক অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে। লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বাংলার লোকশিল্প। কাব্যের বর্ণনা অনুসারে যে আল্লনা বা লক্ষ্মীর সরা চিত্রিত হয়, তা বাংলার প্রাচীন চিত্রকলা ও নন্দনতত্ত্বের পরিচয় দেয়।

লক্ষ্মী পূজার সময় এসব কাব্য কাহিনি আজও পাঠ করা হয়। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এই পালাগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ দিকের প্রতিফলন আমরা এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনুধাবন করতে পারি। এই কাব্যটি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি সমাজের চলমান মানুষের শোভাযাত্রা।

Reference:

১. বেরা শ্যামল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), 'লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)', বসন্ত ২০১১, সূচনাপত্র পত্রিকা (ক্রোড়পত্র), মন্দিরপাড়া, জগাছা, হাওড়া ৭১১১১১, সহজপাঠ, পৃ. ৫
২. তদেব, পৃ. ৫
৩. তদেব, পৃ. ৬
৪. তদেব, পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ৭
৬. তদেব, পৃ. ৫০
৭. তদেব, পৃ. ৫২
৮. তদেব, পৃ. ৫৫
৯. তদেব, পৃ. ৬৫
১০. তদেব, পৃ. ৬৭
১১. তদেব, পৃ. ৬৯